সৎ কাজ করার, (বিশেষত) নামায কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার; (অর্থাৎ নির্দেশ দিলাম যে, এসব কাজ কর।) তারা আমার (খুব) ইবাদত করত। (অর্থাৎ তাদেরকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তা তারা উত্তমরূপে পালন করত। সুতরাং صَالِحِينَ বলে নবুয়তের পূর্ণতার দিকে, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ বলে জ্ঞানগত পূর্ণতার দিকে, كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ বলে কর্মগত পূর্ণতার দিকে এবং أَئِمَّةً يَهْدُونَ বলে অন্যদের হিদায়তের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ—আয়াতের ভাষা বাহ্যত একথাই বোঝায় যে, এ কথাটি ইবরাহীম (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, ইবরাহীম (আ) তাদের কাছে إِنِّي سَقِيمٌ (আমি অসুস্থ)-এর ওযর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধানে রত হল যে, কাজটি কে করল? যদি ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমেই তারা বুঝে নিত যে, ইবরাহীমই এ কাজ করেছে। এর জওয়াব হিসেবে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় তাঁর কোন শক্তি ছিল না। একথা ভেবেই সম্ভবত তাঁর কথার দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নি এবং ভুলেও যায়।—(বয়ানুল কোরআন) এটাও সম্ভবপর যে, যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। ইবরাহীম (আ)-এর কথাবার্তা তারা জানত না। তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ বলেন ঃ ইবরাহীম (আ) উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেন নি; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু'একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে।—(কুরতুবী)

جُذَاذًا—فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا শব্দটি جُذٌّ এর বহুবচন। এর অর্থ খণ্ড। অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন।

إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ—অর্থাৎ শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই দিলেন।

এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চাইতে বড় ছিল, না হয় আকার-আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত।

لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ—إِلَيْهِ শব্দের সর্বনাম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে দুই রকম সম্ভাবনা আছে। এক, এই দুই সর্বনাম দ্বারা ইবরাহীম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণনা করে আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করুক যে, তুমি এ কাজ কেন করলে? এরপর আমি তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত করব। এর অন্য এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজার যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। দুই, কলবী বলেন, সর্বনাম দ্বারা كَبِيرٌ (প্রধান মূর্তি)-কে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা ফিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকে খণ্ডবিখণ্ড এবং বড় মূর্তিকে আস্ত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবত এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হল? সে যখন কোন উত্তর দেবে না তখন তার অক্ষমতাও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি মিথ্যা নয়—রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ঃ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ—

ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা গ্রেফতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্যে প্রশ্ন করল ঃ তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কি? তখন ইবরাহীম (আ) জওয়াব দিলেন ঃ না, এদের প্রধানই এ কাজ করেছে। যদি তার কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো ইবরাহীম (আ) নিজে করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যত বাস্তববিরোধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহ্‌র দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আ) এহেন মিথ্যাচারের অনেক উর্ধ্বে। এ প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য তফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপ তথা বয়ানুল কোরআনে যে সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর এ উক্তি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে ছিল; অর্থাৎ তোমরা এ কথা ধরে নাও না কেন যে, এ কাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না; যেমন কোরআনে

আছে---اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থাৎ রহমান আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তার ইবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মল ও দ্ব্যর্থহীন সওয়াব বাহ্‌রে মুহীত, কুরতুবী, রূহুল মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে اسناد مجازی তথা রূপক ভঙ্গিতে ইবরাহীম (আ) যে কাছ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা, এ মূর্তিটিই ইবরাহীম (আ)-কে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবত ঐ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত যদি কোন বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করি নি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা, তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ।

হযরত ইবরাহীম (আ) কার্যতও মূর্তি ভাঙ্গাকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছিলেন। রেওয়ায়তে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে, সে-ই এ কাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি انبت الربيع البقلة (অর্থাৎ বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।) এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনিভাবে ইবরাহীম (আ)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যত ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দীনী উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবত পূজায় অন্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে এ কাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তওহীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরীকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রব্বুল আলামীন আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রস্তরদের শরীকানা নিজেদের সাথে কিরূপে মেনে নেবেন?

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল যে যাদেরকে আমরা আল্লাহ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্রূপ হত, কেউই তাদেরকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকা উচিত। তাই বলা হয়েছে: فَاسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ মোটকথা, কোনরূপ দ্ব্যর্থতার আশ্রয় না নিয়ে ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে,

ইবরাহীম (আ) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। এরূপ করা হলে তাতে কোনরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ ঃ এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, সহীহ্ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ان ابراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث ---অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) তিন জায়গা ব্যতীত কোন দিন মিথ্যা কথা বলেন নি।---(বুখারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি মিথ্যা খাস আল্লাহ্র জন্য বলা হয়েছে। একটি بل فعله كبيرهم ---আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে ওযর পেশ করে انى سقيم (আমি অসুস্থ) বলা এবং তৃতীয়টি স্ত্রীর হেফাযতের জন্য বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আ) স্ত্রী হযরত সারাহ্সহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল জালিম ও ব্যভিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে তার স্ত্রীকে দেখলে সে স্ত্রীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যভিচার করত। কিন্তু কোন কন্যা স্বীয় পিতার সাথে কিংবা ভগিনী স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রীসহ এই জনপদে পৌঁছার খবর কেউ এই জালিম ব্যভিচারীর কাছে পৌঁছিয়ে দিলে সে হযরত সারাহ্কে গ্রেফতার করিয়ে আনল। গ্রেফতারকারীরা ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? ইবরাহীম (আ) জালিমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলে দিলেন ঃ সে আমার ভগিনী। (এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা।) কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারাহ্কে গ্রেফতার করা হল। ইবরাহীম (আ) সারাহ্কেও বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমিও এর বিপরীত বলো না। কারণ, ইসলামী সম্পর্কে তুমি আমার ভগিনী। এখন এই দেশে আমরা দু'জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বে সম্পর্কশীল। ইবরাহীম (আ) জালিমের মুকাবিলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্র কাছে সানুনয় প্রার্থনার জন্যে নামায পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ্ জালিমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখনি সে অবশ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। তখন সে সারাহ্কে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহ্র দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়াতে চাইল। কিন্তু আল্লাহ্র হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনিভাবে তিনবার এরূপ ঘটনা ঘটার পর সে সারাহ্কে ফেরত পাঠিয়ে দিল (এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ)। এই হাদীসে ইবরাহীম (আ)-এর দিকে পরিষ্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে,

তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না; বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় 'তওরিয়া'। এর অর্থ দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফিকাহ্-বিদদের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লিখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, ইবরাহীম (আ) নিজেই সারাহ্কে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলো। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমরা উভয়েই ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলা বাহুল্য, এটাই তওরিয়া। এই তওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের 'তাকায়্যুহ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহর মধ্যে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তওরিয়াতে পরিষ্কার মিথ্যা বলা হয় না; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে; যেমন ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী হওয়া। উল্লিখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না বরং তওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমোক্ত দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে।

بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ -এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। اِنِّىْ سَقِيْمٌ বাক্যটিও তদ্রূপ। কেননা, سَقِيْمٌ (অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবরাহীম (আ) দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েই 'আমি অসুস্থ' বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বুঝেছিল। এই হাদীসেই "তিনটির মধ্যে দু'টি মিথ্যা আল্লাহ্র জন্য ছিল" এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোন গোনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গোনাহের কাজ আল্লাহ্র জন্য করার কোন অর্থই হতে পারে না। গোনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে---একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

ইবরাহীম (আ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে ভ্রান্ত আখ্যা দেওয়া মূর্খতা ঃ মির্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পাশ্চাত্তের পণ্ডিতদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহ্র দোস্ত ইবরাহীম (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই খলিলুল্লাহ্কে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেওয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কোরআনের পরিপন্থী। এরপর তারা এ থেকে একটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস কোরআনের পরিপন্থী হবে, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং

মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীস-বিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা যায়। বরং স্বল্পবুদ্ধিতা ও বক্রবুদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কোরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে এ কথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কোরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, 'তিনটি মিথ্যা' বলে যে তওরিয়া বোঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তওরিয়া বোঝাতে গিয়ে كذب (মিথ্যা) শব্দ কেন ব্যবহার করা হল? এর কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় মূসা (আ)-র কাহিনীতে হযরত আদম (আ)-এর ভুলকে غوى ও عصى শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আযীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। কোরআন পাকে এ ধরনের বিষয়ে পয়গম্বরদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধবাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য পয়গম্বরদের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর কোন ত্রুটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্য দণ্ডায়মান হবেন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ হাদীসে বর্ণিত ঐ তওরিয়ার ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যকে নিজের দোষ ও ত্রুটি সাব্যস্ত করে ওযর পেশ করবেন। এই ত্রুটির দিকে ইশারা করার জন্য হাদীসে এগুলোকে كذب তথা 'মিথ্যা' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা)-র এরূপ করার অধিকার ছিল এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও এরূপ বলার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আ) মিথ্যা বলেছেন বললে তা জায়েয হবে না। সূরা তোয়া-হায় মূসা (আ)-র কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন অথবা হাদীসে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কোরআন তিলাওয়তে, কোরআন শিক্ষা অথবা হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

উল্লিখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সূক্ষ্মতা ঃ হাদীসে ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে উল্লিখিত তিনটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু'টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহ্‌র জন্য ছিল; কিন্তু হযরত সারাহ্ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয় নি। অথচ স্ত্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাৎ দীনের কাজ। এ সম্পর্কে তফসীরে-কুরতুবীতে কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী থেকে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন ঃ তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি

সৎকর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। যদিও এটা দীনেরই কাজ ছিল, কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরেমের হেফাযত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে فى الله (আল্লাহ্‌র মধ্যে) এবং لله (আল্লাহ্‌র জন্য) এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ الا لله الدين الخالص---(খাঁটি ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্যই)

স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারও হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরোক্ত তালিকায় গণ্য করা হত। কিন্তু পয়গম্বরদের মাহাত্ম্য সবার ওপরে। তাদের জন্য এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থী মনে করা হয়েছে।

ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড পুষ্পোদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপ ঃ যারা মু'জিযা ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলী অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোন বস্তুর সত্তার জন্য অপরিহার্য হয়, তা কোন সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না ---দর্শনশাস্ত্রের এই নীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে কোন বস্তুর সত্তার জন্য কোন গুণ অপরিহার্য নয়। বরং আল্লাহ্‌র চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্য উত্তাপ ও প্রজ্বলিত করা জরুরী, পানির জন্য ঠাণ্ডা করা ও নির্বাপণ করা জরুরী; কিন্তু এই জরুরী অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ---যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি। এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যস্ত, তখন আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন বিশেষ রহস্যের কারণে কোন অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোন যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাপণ ও শীতল করার কাজ ও পানি প্রজ্বলন কাজ করতে শুরু করেন; অথচ অগ্নিসত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে; তবে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্য তা আল্লাহ্‌র নির্দেশে স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে থাকে। পয়গম্বরদের নবুয়ত প্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যেসব মু'জিযা প্রকাশ করেন, সেগুলোর সারমর্ম তাই। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন ঃ তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি بردا (শীতল) শব্দের আগে وسلاما (নিরাপদ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। নূহ (আ)-র সলিল সমাধিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ اغرقوا فادخلوا نارا---অর্থাৎ তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে।

حَرِّقُوْهُ ----অর্থাৎ সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হোক। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। এরপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে সাতদিন পর্যন্ত প্রজ্বলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইব্রাহীম (আ)-কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য কারও ছিল না। শয়তান ইব্রাহীম (আ)-কে 'মিন্‌জানিকে' (এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত্র) রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় ইব্রাহীম (আ) মিনজানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত সৃষ্ট জীব চীৎকার করে উঠল ঃ ইয়া রব, আপনার দোস্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ্ তাদের সবাইকে ইব্রাহীম (আ)-এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্য ইব্রাহীম (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জওয়াব দিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হল ঃ প্রয়োজন তো আছে; কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে। ---(মাযহারী)

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ----পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্রাহীম (আ)-এর পক্ষে সম্ভবত অগ্নি অগ্নিই ছিল না; বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যত অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং ইব্রাহীম (আ)-এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দাহন করছিল। ইব্রাহীম (আ)-কে যেসব রশি দ্বারা বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইব্রাহীম (আ)-এর দেহে সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতসমূহে আছে, ইব্রাহীম (আ) এই অগ্নিকুণ্ডে সাতদিন ছিলেন। তিনি বলতেন ঃ এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবন তা ভোগ করিনি।---(মাযহারী)

وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ----অর্থাৎ ইব্রাহীম ও লূতকে আমি নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ (অর্থাৎ ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাস-স্থল। অভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গম্বরদের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদনদীর প্রাচুর্য,

ফলমূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً---অর্থাৎ আমি তাঁকে (দোয়া ও অনুরোধ অনুযায়ী) পুত্র ইসহাক এবং অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে نَافِلَةً বলা হয়েছে।

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ۝ وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا ۭ اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(৭৪) এবং আমি লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মন্দ ও নাফরমান সম্প্রদায় ছিল। (৭৫) আমি তাকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সে ছিল সৎকর্মশীলদের একজন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং লূত (আ)-কে আমি (পয়গম্বরদের উপযোগী) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম, যার অধিবাসীরা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। (তন্মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট কাজ ছিল পুংমৈথুন। এ ছাড়া আরও অনেক অনর্থক ও মন্দ কাজে তারা অভ্যস্ত ছিল; যথা মদ্যপান, গান-বাজনা, শ্মশ্রু মুণ্ডন, গোঁফ লম্বা করা, কবুতর-বাজি, ঢিলা নিক্ষেপ, শিস বাজানো, রেশমী বস্ত্র পরিধান।—(রূহুল মা'আনী) নিশ্চয় তারা মন্দ ও পাপাচারী সম্প্রদায় ছিল। আমি লূতকে আমার রহমতের (অর্থাৎ যাদের প্রতি রহমত হয়, তাদের) অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। (কেননা) নিঃসন্দেহে সে (উচ্চস্তরের) সৎকর্মশীলদের একজন ছিল (উচ্চস্তরের সৎকর্মপরায়ণ অর্থ নিষ্পাপ, পবিত্র, যা পয়গম্বরের বৈশিষ্ট্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যে জনপদ থেকে লূত (আ)-কে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদুম। এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে জিবরাঈল ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লূত (আ) ও তাঁর সঙ্গী মু'মিনদের বসবাসের জন্য একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেওয়া হয়েছিল।---(কুরতুবী)

تعمل الخبائث—خبائث শব্দটি خبيثة এর বহুবচন। অনেক নোংরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে خبائث বলা হয়। 'লাওয়াতাত' ছিল তাদের সর্ববৃহৎ নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্তুরাও বেঁচে থাকে। অর্থাৎ পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটিমাত্র অভ্যাসকেই خبائث বলা হয়ে থাকলে তাও অবান্তর নয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লিখিত আছে। রূহুল মা'আনীর বরাত দিয়ে তফসীরের সার-সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এ দিক দিয়ে সমষ্টিকে خبائث বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। و الله اعلم

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝٧٦ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٧٧

---

(৭৬) এবং স্মরণ করুন নূহকে ; যখন তিনি এর পূর্বে আহবান করেছিলেন, তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (৭৭) এবং আমি তাকে ঐ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয়, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং নূহ (আ)-এর (কাহিনী) আলোচনা করুন, যখন এর (অর্থাৎ ইব্রাহিমী আমলের) পূর্বে তিনি (আল্লাহ্‌র কাছে) দোয়া করেছিলেন (যে, কাফিরদের কাছ থেকে আমার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।) তখন আমি তাঁর দোয়া কবূল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (এই সংকট কাফিরদের মিথ্যারোপ ও নানারূপ নির্যাতনের ফলে দেখা দিয়েছিল। উদ্ধার এভাবে করেছিলাম যে) আমি ঐ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাঁর প্রতিশোধ নিয়েছিলাম, যারা আমার বিধানসমূহকে (যেগুলো নূহ আনয়ন করেছিলেন) মিথ্যা বলত নিশ্চয় তারা ছিল খুব মন্দ সম্প্রদায়। তাই আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مِنْ قَبْلُ—وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ -এর অর্থ ইব্রাহীম ও লূত (আ)-এর পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নূহ (আ)-এর যে আহ্বানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নূহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন ঃ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا----অর্থাৎ হে পরওয়ারদিগার, পৃথিবীর বুকে কোন কাফির অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। অন্যত্র আছে, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় যখন কোনরূপেই তাঁর উপদেশ মানল না, তখন তিনি আল্লাহ্র দরবারে আরয করলেন أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ----অর্থাৎ আমি অপারক ও অক্ষম হয়ে গেছি। আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ—كرب عظم (মহা-সংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্যাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নূহ (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি চালাত।

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ
الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا
آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ
وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ
بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً
تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ
عَالِمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ
ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾

(৭৮) এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি সুলায়মানকে সেই ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। (৮০) আমি তাঁকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? (৮১) এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত আছি। (৮২) এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তার জন্য ডুবুরির কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে স্মরণ করুন, যখন উভয়েই কোন শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে (যাতে শস্য কিংবা আঙ্গুর বৃক্ষ ছিল) বিচার করছিলেন। তাতে (ক্ষেতে) কিছু লোকের মেষপাল রাত্রিকালে ঢুকে পড়েছিল (এবং ফসল খেয়ে ফেলেছিল)। এই ফয়সালা যা (মুকদ্দমা পেশকারী) লোকদের সম্পর্কে হয়েছিল, আমার সম্মুখে ছিল। অতঃপর সেই ফয়সালা (অর্থাৎ ফয়সালার সহজ পদ্ধতি) সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং (এমনিতেই) আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। [অর্থাৎ, দাউদের ফয়সালাও শরীয়তবিরোধী ছিল না। মোকদ্দমাটি ছিল এরূপ ঃ শস্যের যতটুকু ক্ষতি হয়েছিল, তার মূল্য মেষপালের মূল্যের সমান ছিল। দাউদ (আ) জরিমানায় ক্ষেতের মালিককে মেষপাল দিয়েছিলেন। আইনের বিচার তাই ছিল। তাই সুলায়মান (আ) আপোসরফা হিসেবে উভয় পক্ষের রেয়াত করে প্রস্তাব দিলেন যে, কিছু দিনের জন্য মেষপাল ক্ষেতের মালিকদেরকে দেওয়া হোক। তারা এদের দুধ ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে এবং মেষপালের মালিকদের শস্যক্ষেত্র দেওয়া হোক। তারা পানি সেচ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষেতের যত্ন নেবে। যখন ক্ষেতের ফসল পূর্ববর্তী অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন ক্ষেত ও মেষপাল তাদের মালিকদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হোক। এই আপোসরফা কার্যকর হওয়ার জন্য উভয় পক্ষের সম্মতি শর্ত।---(দুররে মনসুর) এ থেকে জানা গেল যে, উভয় ফয়সালার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই যে, একটি শুদ্ধ হলে অপরটি অশুদ্ধ হবে। তাই وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا যোগ করা হয়েছে।) এবং [এ পর্যন্ত দাউদ ও সুলায়মান (আ) উভয়ের ব্যাপক ও অভিন্ন মাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তাদের বিশেষ বিশেষ মর্যাদা ও অলৌকিকতার বর্ণনা হচ্ছে ঃ] আমি পর্বতসমূহকে দাউদের সাথে অধীন করে দিয়েছিলাম, (তাঁর তসবীহ্ পাঠের সাথে) তারা (ও)

তসবীহ্ পাঠ করত এবং (এমনিভাবে) পক্ষীসমূহকেও; (যেমন সূরা সাবায় রয়েছে يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ---কেউ যেন এতে আশ্চর্যবোধ না করে। কেননা, এসব কাজের) আমিই ছিলাম কর্তা। (আমার মহান শক্তি-সামর্থ্য বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। এমতাবস্থায় এসব মু'জিযায় আশ্চর্যের কি আছে? আমি তাকে তোমাদের (উপকারের) জন্য বর্মনির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা (অর্থাৎ বর্ম) তোমাদেরকে (যুদ্ধে) একে অপরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। (এই বিরাট উপকারের দাবি এই যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হও।) অতএব (এই নিয়ামতের) শোকর করবে (না) কি? আমি সুলয়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে, তা তাঁর আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হত, যাতে আমি কল্যাণ রেখেছিলাম। [অর্থাৎ সিরিয়া দেশ। এটা তাঁর বাসস্থান ছিল। অর্থাৎ তাঁর সিরিয়া থেকে কোথাও যাওয়া এবং ফিরে আসা উভয়ই বায়ুর মাধ্যমে হত। দুররে মনসূরে বর্ণিত রয়েছে যে, সুলায়মান (আ) পারিষদবর্গসহ নিজ নিজ আসনে উপবেশন করতেন। এরপর বায়ুকে ডেকে আদেশ করতেন। বায়ু সবাইকে উঠিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে এক এক মাসের দূরত্বে পৌঁছিয়ে দিত।] আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত আছি। (সুলায়মানকে এ-সব বিষয়দানের রহস্য আমার জানা ছিল। তাই দান করেছিলাম।) শয়তানদের মধ্যে (অর্থাৎ জিনদের মধ্যে) কতক সুলায়মান (আ)-এর জন্য (সমুদ্রে) ডুবুরির কাজ করত (যাতে মোতি বের করে তাঁর কাছে আনে) এবং এ ছাড়া তারা অন্য আরও অনেক কাজ (সুলায়মানের জন্য) করত। (জিনরা খুবই অবাধ্য ও দুষ্ট ছিল; কিন্তু) আমিই তাদেরকে সামাল দিতাম (ফলে তারা টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারত না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ—অভিধানে نفش শব্দের অর্থ রাত্রিকালে শস্যক্ষেত্রে জন্তু ঢুকে পড়ে ক্ষতিসাধন করা।

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ—فَفَهَّمْنَاهَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত মোকদ্দমা ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মোকদ্দমা ও ফয়সালার বিবরণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, দাউদ (আ)-এর ফয়সালাও শরীয়তের আইনের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সুলায়মান (আ)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয় পক্ষের রেয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহ্র কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগভী হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ্ ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেনঃ দুই ব্যক্তি হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও অপরজন শস্যক্ষেত্রের

মালিক। শস্যক্ষেত্রের মালিক ছাগপালের মালিকের বিরুদ্ধে দাবি করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেত্রে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে; কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। (সম্ভবত বিবাদী স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ছাগপালের মূল্য ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মূল্যের সমান ছিল। তাই) হযরত দাউদ (আ) রায় দিলেন যে, ছাগপালের মালিক তার সমস্ত ছাগল শস্যক্ষেত্রের মালিককে অর্পণ করুক। (কেননা, ফিকাহ্‌র পরিভাষায় 'যাওয়াতুল কিয়াম' অর্থাৎ যেসব বস্তু মূল্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়, সেগুলো কেউ বিনষ্ট করলে তার জরিমানা মূল্যের হিসাবেই দেওয়া হয়। ছাগপালের মূল্য বিনষ্ট ফসলের মূল্যর সমান বিধায় বিধি মোতাবেক এই রায় দেওয়া হয়েছে।) বাদী ও বিবাদী উভয়ই হযরত দাউদের আদালত থেকে বের হয়ে আসলে (দরজায় তাঁর পুত্র) সুলায়মান (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা তা শুনিয়ে দিল। হযরত সুলায়মান বললেন ঃ আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয় পক্ষের জন্য উপকারী হত। অতঃপর তিনি পিতা দাউদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ কথা জানালেন। হযরত দাউদ বললেন ঃ এই রায় থেকে উত্তম এবং উভয়ের জন্য উপকারী রায়টা কি? সুলায়মান বললেন ঃ আপনি ছাগপাল শস্যক্ষেত্রের মালিককে দিয়ে দিন। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক এবং ক্ষেত ছাগপালের মালিককে অর্পণ করুন। সে তাতে চাষাবাদ করে শস্য উৎপন্ন করবে। যখন শস্যক্ষেত্র ছাগপালের বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যায়, তখন শস্যক্ষেতের মালিককে এবং ছাগপাল ছাগলের মালিককে প্রত্যর্পণ করুন। হযরত দাউদ (আ) এই রায় পছন্দ করে বললেন ঃ বেশ এখন এই রায়ই কার্যকর হবে। অতঃপর তিনি উভয় পক্ষকে ডেকে দ্বিতীয় রায় কার্যকর করলেন।

রায় দানের পর কোন বিচারকের রায় ভঙ্গ ও পরিবর্তন করা যায় কি? এখানে প্রশ্ন হয়, দাউদ (আ) যখন এক রায় দিয়েছিলেন, তখন সুলায়মান (আ)-এর কি তা ভঙ্গ করার অধিকার ছিল? যদি হযরত দাউদ নিজেই তাঁর রায় শুনে নিজের সাবেক রায় ভঙ্গ করে দ্বিতীয় রায় জারি করে থাকেন, তবে কোন বিচারকের এরূপ করার অধিকার আছে কিনা?---অর্থাৎ রায় দেওয়ার পর নিজেই তা ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা।

কুরতুবী এখানে এ ধরনের বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আলোচনার সারমর্ম এই যে, যদি কোন বিচারক শরীয়তের প্রমাণাদি ও সাধারণ মুসলিম আইনবিদদের মতামতের বিপক্ষে কোন রায় শুধু অনুমানের ভিত্তিতে দান করে, তবে সেই রায় সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল গণ্য হবে। অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায়ের বিপরীত রায় দেওয়া শুধু জায়েয়ই নয়; বরং ওয়াজিব এবং এই বিচারককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব। কিন্তু যদি কোন বিচারকের রায় শরীয়তসম্মত ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল এবং ইজতিহাদের মূলনীতির অধীন হয়, তবে অন্য বিচারকের পক্ষে এই রায় ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা, এই রীতি প্রবর্তিত হলে মহা অনর্থ দেখা দেবে, ইসলামী আইন ক্রীড়নকে পরিণত হবে এবং রোজই হালাল ও হারাম পরিবর্তিত হবে। তবে যদি রায়দানকারী বিচারক স্বয়ং ইজতিহাদের মূলনীতি

অনুযায়ী রায়দান করার পর ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণে দেখে যে, প্রথম রায় ও প্রথম ইজতিহাদে ভুল হয়ে গেছে, তবে তা পরিবর্তন করা জায়েয বরং উত্তম। হযরত উমর ফারূক (রা) আবূ মূসা আশআরীর নামে বিচার ও রায়দানের মূলনীতি সম্বলিত একটি বিস্তারিত চিঠি লিখেছিলেন। তাতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, রায় দেয়ার পর ইজতিহাদ পরিবর্তিত হয়ে গেলে প্রথম রায় পরিবর্তন করা উচিত। এই চিঠি দারাকুতনী সনদসহ বর্ণনা করেছেন।---(কুরতুবী সংক্ষেপিত) শামসুল আয়িম্মা সুরখসী মবসূতেও এই চিঠি বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেনঃ হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান উভয়ের রায় স্ব স্ব স্থানে বিশুদ্ধ। এর স্বরূপ এই যে, দাউদ (আ)-এর রায় ছিল বিধি মোতাবেক এবং সুলায়মান (আ) যা বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে মোকদ্দমার রায় ছিল না; বরং উভয় পক্ষের মধ্যে আপস করার একটি পন্থা। কোরআনে وَالصُّلْحُ خَيْرٌ (অর্থাৎ আপস করা উত্তম) বলা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় পন্থাই আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় হয়েছে।---(মযহারী)

হযরত উমর ফারূক (রা) বিচারকদেরকে এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, যখন দুই পক্ষ মোকদ্দমা নিয়ে উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপস-রফার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে শরীয়তের রায় জারি করতে হবে। তিনি এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ বিচারকসুলভ আইনগত ফয়সালা যে ব্যক্তির বিপক্ষে যায়, সে সাময়িকভাবে দমে গেলেও উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিহিংসা ও শত্রুতার বীজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা দুই মুসলমানের মধ্যে না থাকা উচিত। পক্ষান্তরে আপস-রফার ফলে অন্তরগত ঘৃণা-বিদ্বেষও দূর হয়ে যায়। (---মুঈনুল হুক্কাম)

মুজাহিদের এই উক্তি অনুযায়ী দাউদ (আ)-এর ব্যাপারটিতে রায় ভঙ্গ করা ও পরিবর্তন করা হয়নি; বরং উভয় পক্ষকে রায় শোনানোর পর তাদের উপস্থিতিতেই আপস-রফার একটি পন্থা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে এবং উভয় পক্ষ তাতে সম্মত হয়ে গেছে।

দুই মুজতাহিদ যদি দুইটি পরস্পর বিরোধী রায় দান করেন, তবে প্রত্যেকটি শুদ্ধ হবে, না কোন একটিকে ভ্রান্ত বলা হবেঃ এ স্থলে কুরতুবী বিস্তারিতভাবে এবং অন্যান্য তফসীরবিদ বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন যে, প্রত্যেক মুজতাহিদ সর্বদা সত্য রায়ই দান করে এবং দুইটি পরস্পরবিরোধী ইজতিহাদ হলে উভয়টিকে সত্য মনে করা হবে, না একটিকে ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ সাব্যস্ত করা হবে? এ ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই আলিমগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ। আলোচ্য আয়াত থেকে উভয় দলই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। যারা বলে, পরস্পরবিরোধী হলেও উভয় ইজতিহাদ সত্য, তাদের প্রমাণ আয়াতের শেষ বাক্য। এতে বলা হয়েছেঃ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

এতে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করার কথা বলা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি কোনরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়নি এবং একথাও বলা হয়নি যে, তিনি ভুল করেছেন। এতে জানা গেল যে, দাউদ (আ)-এর রায় সত্য ছিল এবং সুলায়মান (আ)-এর রায়ও। তবে সুলায়মান (আ)-এর রায়কে উভয় পক্ষের জন্যে অধিক উপযোগী হওয়ার কারণে অগ্রাধিকার দান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বলে, ইজতিহাদী মতভেদের স্থলে এক পক্ষ সত্য ও অপর পক্ষ ভ্রান্ত হয় তাদের প্রমাণ আয়াতের প্রথম বাক্য ; অর্থাৎ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ----এতে বিশেষ করে হযরত সুলায়মান (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমি তাকে সত্য রায় বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। এতে প্রমাণিত হয় যে, দাউদ (আ)-এর রায় সঠিক ছিল না। তবে তিনি ইজতিহাদের কারণে এ ব্যাপারে ক্ষমার্হ ছিলেন এবং তাকে এ কারণে ধরপাকড় করা হয়নি। উসূলে ফিকাহ্‌র কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে। এখানে শুধু এতটুকু বুঝে নেয়াই যথেষ্ট যে, হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ধর্মীয় নির্দেশ বর্ণনা করে, তার ইজতিহাদ বিশুদ্ধ হলে সে দুই সওয়াব পাবে---একটি ইজতিহাদ করার এবং অপরটি বিশুদ্ধ নির্দেশ পর্যন্ত পৌঁছার। পক্ষান্তরে যদি ইজতিহাদ নির্ভুল না হয় এবং সে ভুল করে বসে, তবে সে ইজতিহাদের শ্রম স্বীকার করার কারণে এক সওয়াব পাবে। নির্ভুল নির্দেশ পর্যন্ত পৌঁছার দ্বিতীয় সওয়াব সে পাবে না (অধিকাংশ প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে)। এই হাদীস থেকে আলিমগণের উপরোক্ত মতভেদের স্বরূপও স্পষ্ট হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা শাব্দিক মতবিরোধের মতই। কেননা, উভয় পক্ষ সত্যপন্থী হওয়ার সারমর্ম এই যে, ভুলকারী মুজতাহিদ ও তার অনুসারীদের জন্যেও ইজতিহাদটি সত্য ও বিশুদ্ধ। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করলে তারা মুক্তি পাবে, যদিও ইজতিহাদটি সত্তার দিক দিয়ে ভুলও হয়। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী যারা আমল করবে, তাদের গোনাহ্ নেই। যারা বলেছেন যে, দুই ইজতিহাদের মধ্যে একটিই সত্য এবং অপরটি ভ্রান্ত, তাদের এ উক্তির সারমর্মও এর বেশী নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত না পৌঁছার কারণে ভুলকারী মুজতাহিদ কম সওয়াব পাবে। ভুলকারী মুজতাহিদকে ভর্ৎসনা করা হবে অথবা তার অনুসারীরা গোনাহ্‌গার হবে---এরূপ উদ্দেশ্য এই মতাবলম্বীদেরও নেই। তফসীরে কুরতুবীতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কারও জন্তু অন্যের জান অথবা মালের ক্ষতি সাধন করলে কি ফয়সালা হওয়া উচিত ঃ হযরত দাউদ (আ)-এর ফয়সালা থেকে জানা যায় যে, জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে ; যদি ঘটনা রাত্রিকালে হয়। কিন্তু এটা জরুরী নয় যে, দাউদ (আ)-এর শরীয়তের ফয়সালা আমাদের শরীয়তেও বহাল থাকবে। এ কারণেই এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদ পোষণ করেন। ইমাম শাফেঈর মযহাব এই যে, যদি রাত্রিকালে কারও জন্তু অপরের ক্ষেতে চড়াও হয়ে ক্ষতি সাধন করে, তবে জন্তুর মালিককে

ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দিনের বেলায় এরূপ হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তাঁর প্রমাণ হযরত দাউদের ফয়সালাও হতে পারে। কিন্তু তিনি ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী একটি হাদীস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। মুয়াত্তা ইমাম মালিকে বর্ণিত আছে যে, বারা ইবনে আযেবের উষ্ট্রী এক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে পড়ে বাগানের ক্ষতিসাধন করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) ফয়সালা দিলেন যে, রাত্রিবেলায় বাগান ও ক্ষেত্রের হিফাযত করা মালিকদের দায়িত্ব। হিফাযত সত্ত্বেও যদি রাত্রিবেলায় কারও জন্তু ক্ষতিসাধন করে, তবে জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও কূফার ফিকাহবিদগণ বলেন যে, যে সময় জন্তুর সাথে রাখাল অথবা হিফাযতকারী থাকে এবং তার গাফিলতির কারণে জন্তু কারও ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তখন জন্তুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ব্যাপারটি রাত্রে হোক কিংবা দিনে। পক্ষান্তরে যদি জন্তুর সাথে মালিক অথবা হিফাযতকারী না থাকে, জন্তু স্বপ্রণোদিত হয়ে কারও ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করে, তবে মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না, ব্যাপারটি দিনে হোক কিংবা রাত্রে। ইমাম আযমের প্রমাণ সে হাদীস, যা বুখারী, মুসলিম ও অন্য হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, جرح لعجماء جبار অর্থাৎ জন্তু কারও ক্ষতি করলে তা ধরপাকড়যোগ্য নয়। অর্থাৎ জন্তুর মালিক ক্ষতিপূরণ দেবে না (অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে এর জন্যে মালিক অথবা রাখাল জন্তুর সঙ্গে না থাকা শর্ত)। এই হাদীসে দিবারাত্রির পার্থক্য ছাড়াই এই আইন বিধৃত হয়েছে যে, যদি জন্তুর মালিক ইচ্ছাকৃতভাবে কারও ক্ষেতে জন্তু ছেড়ে না দেয়, জন্তু নিজেই চলে যায়, তবে মালিককে ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে না। বারা ইবনে আযেবের ঘটনা সে রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হানাফী ফিকাহবিদগণ তার সনদের সমালোচনা করে বলেছেন যে, বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীসের মোকাবেলায় তা প্রমাণ হতে পারে না।

পর্বত ও পক্ষীকুলের তসবীহ ঃ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ --- হযরত দাউদ (আ) -কে আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক গুণাবলীর মধ্যে সুমধুর কণ্ঠস্বরও দান করেছিলেন। তিনি যখন যবূর পাঠ করতেন, তখন বিহঙ্গকুল শূন্যে থেমে যেত এবং তাঁর সাথে তসবীহ পাঠ করতে থাকত। এমনিভাবে পর্বত ও বৃক্ষ থেকেও তসবীহর আওয়াজ শোনা যেত। সুমধুর কণ্ঠস্বর ছিল একটি বাহ্যিক গুণ এবং পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের তসবীহ পাঠে শরীক হওয়া ছিল আল্লাহ্র কুদরতের অধীন একটি মু'জিযা। মু'জিযার জন্যে পক্ষীকুল ও পর্বতসমূহের মধ্যে জীবন ও চেতনা থাকা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক অচেতন বস্তুর মধ্যেও মু'জিযা হিসেবে চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও তাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান আছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশআরী অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন। একদিন তিনি যখন কোরআন তিলাওয়াতে রত ছিলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাঁর তিলাওয়াত শোনার জন্যে থেমে পড়েন এবং নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকেন।

এরপর তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হযরত দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরই দান করেছেন। আবূ মূসা যখন জানতে পারলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর তিলাওয়াত শুনেছেন তখন আরয করলেনঃ আপনি শুনছেন---একথা আমার জানা থাকলে আমি আরও সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম। (ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন তিলাওয়াতে সুন্দর স্বর ও চিত্তাকর্ষক উচ্চারণ এক পর্যায়ে কাম্য ও পছন্দনীয়। তবে আজকালকার কারীদের ন্যায় এতো বাড়াবাড়ি না হওয়া চাই। তাঁরা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করার জন্যে শুধু আওয়াজ সুন্দর করারই চেষ্টা করে থাকেন। ফলে তিলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যই গায়েব হয়ে যায়।

বর্ম নির্মাণ পদ্ধতি দাউদ (আ)-কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিলঃ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ---অস্ত্র জাতীয় সামগ্রীর মধ্যে যেগুলো পরিধান করে অথবা গলায় লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়, অভিধানের দিক দিয়ে তাকেই لباس বলা হয়। এখানে লৌহবর্ম বোঝানো হয়েছে, যা যুদ্ধে হিফাযতের জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্য এক আয়াতে আছে وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ---অর্থাৎ আমি দাউদের জন্য লোহা নরম করে দিয়েছিলাম। এই নরম করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক, তাঁর হাতের স্পর্শে লোহা আপনা-আপনি নরম হয়ে যেত, তিনি মোমের ন্যায় তাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটা সরু করতে পারতেন। দুই, আগুনে লাগিয়ে নরম করার কৌশল তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল, যা আজকাল লৌহ কারখানাসমূহে অনুসৃত হয়।

যে শিল্প দ্বারা সাধারণ লোকের উপকার হয়, তা কাম্য ও পয়গম্বরগণের কাজঃ আলোচ্য আয়াতে বর্ম নির্মাণ শিল্প দাউদ (আ)-কে শিখানোর কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে এর রহস্যও বলে দেওয়া হয়েছে যে, لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ অর্থাৎ যাতে এই বর্ম তোমাদেরকে যুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ তরবারির বিপদ থেকে হিফাযত করে। এই প্রয়োজন থেকে দীনদার হোক কিংবা দুনিয়াদার, কেউই মুক্ত নয়। তাই এই শিল্প শিক্ষা দেয়াকে আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত আখ্যা দিয়েছেন। এ থেকে জানা গেল যে, যে শিল্পের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, তা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাকা এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গম্বরগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্প কর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে; যেমন দাউদ (আ) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মূসা জননীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফিরাউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনিভাবে যে জনসেবার নিয়তে শিল্প কর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাবেই; তদুপরি

শিল্পকর্মের পার্থিব উপকারও সে লাভ করবে। সূরা তোয়া-হায় মূসা (আ)-র কাহিনীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাস'আলা ঃ হযরত হাসান বসরী (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন সুলায়মান (আ)-এর আসরের নামায ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি গাফিলতির মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে ছেড়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি এ কাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ---এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেমন দাউদ (আ)-এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াযের সাথে তসবীহ পাঠ করত, তেমনি সুলায়মান (আ)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুর কাঁধে সওয়ার হয়ে তিনি যথা ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যেতেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, দাউদ (আ)-এর বশীকরণের মধ্যে مَعَ (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে لَ (জন্য) অক্ষর ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। দাউদ (আ) যখন তিলাওয়াত করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল আপনা-আপনি তসবীহ পাঠ শুরু করত, তাঁর আদেশের জন্য অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি যখন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিত ; যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত।---(রূহুল মা'আনী, বায়যাভী)

তফসীরে ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুলায়মান (আ) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পারিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হত, সেখানে পৌঁছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব এবং দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব অতিক্রম করত অর্থাৎ একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, সুলায়মান (আ)-এর এই সিংহাসনের ওপর ছয় লক্ষ চেয়ার স্থাপন করা হত। এগুলোতে সুলায়মান (আ)-এর সাথে ঈমানদার মানব এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা

উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের ওপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে আদেশ করা হত, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হত, পৌঁছিয়ে দিত। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে সুলায়মান (আ) মাথা নত করে আল্লাহ্‌র যিকর ও শোকরে মশগুল থাকতেন, ডানে-বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন।---(ইবনে কাসীর)

عَاصِفَةً এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ رَخَاءً বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু বাতাস, যার দ্বারা ধূলা ওড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহ্যত এই দুইটি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সত্তাগতভাবে প্রখর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক মাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হত না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোন পাখীরও কোনরূপ ক্ষতি হত না।

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ সুলায়মান (আ)-এর জন্য জিন ও শয়তান বশীভূতকরণঃ

وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ---অর্থাৎ আমি সুলায়মান (আ)-এর জন্য শয়তানদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত; যেমন অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ---অর্থাৎ তারা সুলায়মান (আ)-এর জন্য বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা তৈরী করত। সুলায়মান তাদের অধিক শ্রমের কাজেও নিয়োজিত করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক ছিলাম।

شَيَاطِينَ---শয়তান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নিনির্মিত সূক্ষ্ম দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জাতিকে বোঝাবার জন্য আসলে جِنّ অথবা جِنَّات শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয়---কাফির, তাদেরকে শয়তান বলা হয়। বাহ্যত বোঝা যায় যে, মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সব জিন সুলায়মান (আ)-এর বশীভূত ছিল; কিন্তু মু'মিনরা বশীভূতকরণ

ছাড়াই সুলায়মান (আ)-এর নিদর্শনাবলী ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে শুধু شيا طين তথা কাফির জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদস্তি সুলায়মান (আ)-এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবত এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুবা কাফির জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশংকা সব সময় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব ঃ দাউদ (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাধিক শক্ত ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন; যথা পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। সুলায়মান (আ)-এর জন্য দেখাও যায় না, এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে বশীভূত করেছেন; যেমন বায়ু, জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিসামর্থ্য সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত।—(তফসীর কবীর)

وَ اَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ
الرّٰحِمِیْنَ ﴿۸۳﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّ اٰتَیْنٰهُ اَهْلَهٗ
وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرٰى لِلْعٰبِدِیْنَ ﴿۸۴﴾

(৮৩) এবং স্মরণ করুন আইউবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন ঃ আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (৮৪) অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত এবং ইবাদত-কারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই আইউব (আ)-এর কথা আলোচনা করুন, যখন সে (দুরারোগ্য) রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করে বলল ঃ আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও অধিক দয়াবান (অতএব মেহেরবানী করে আমার কষ্ট দূর করে দিন)। অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তার কষ্ট দূর করলাম এবং (তার অনুরোধ ছাড়াই) তার পরিবারবর্গ (অর্থাৎ যেসব সন্তান-সন্ততি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল অথবা মৃত্যুবরণ করেছিল) ফিরিয়ে দিলাম (তারা তার কাছে এসেছিল কিংবা সমপরিমাণ সন্তান-সন্ততি আরও জন্মগ্রহণ করেছিল) এবং তাদের সাথে (গণনায়) তাদের মত আরও দিলাম (অর্থাৎ পূর্বে যতজন ছিল, তাদের সমান

আরও দিলাম, নিজের ঔরসজাত হোক কিংবা সন্তানের সন্তান হোক) আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত এবং ইবাদতকারীদের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকার জন্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আইউব (আ)-এর কাহিনী ঃ আইয়ূব (আ)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়ায়তই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোর-আন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সবর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সব উধাও হয়ে গিয়েছিল মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোন কারণে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন; বরং তাদের তুলনায় আরও অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের মধ্যে কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক রেওয়ায়তসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফেয ইবনে-কাসীর কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা আইউব (আ)-কে প্রথমদিকে অগাধ ধন-দৌলত, সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালানকোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গম্বরসুলভ পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসব বস্তু তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আ)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়্যা বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আ)। ----(ইবনে-কাসীর) সহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত- মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করতেন এবং তাঁর সেবা-যত্ন করতেন। আইউব (আ)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ

অর্থাৎ পয়গম্বরগণ সবচাইতে বেশী বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সৎকর্মপরায়ণগণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে ঃ প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশী মজবুত; তার বিপদ ও পরীক্ষাও তত অধিক হয় (যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহ্‌র কাছে উচ্চ হয়)। আল্লাহ্ তা'আলা আইউব (আ)-কে পয়গম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন [যেমন দাউদ (আ)]-কে শোকরের

এমনি স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছিল।) বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে আইউব (আ) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ্ বলেনঃ আল্লাহ্ যখন আইউব (আ)-কে অর্থকড়ি সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নিয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহ্র স্মরণ ও ইবাদতে আরও বেশী আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহ্র কাছে আরয করেনঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোন অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

উল্লিখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করার পর হাফেয ইবনে-কাসীর লিখেছেনঃ এই কাহিনী সম্পর্কে ওহ্ব ইবনে মুনাব্বেহ্ থেকে অনেক দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। তবে রেওয়ায়েতগুলো সুবিদিত নয়। তাই আমি সেগুলো উল্লেখ করলাম না।

আইউব (আ)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থী নয়ঃ হযরত আইউব (আ) সাংসারিক ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হা-হুতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেন নি। সতী সাধ্বী স্ত্রী লাইয়্যা একবার আরযও করলেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জওয়াব দিলেনঃ আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনাতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায় (অথচ আল্লাহ্র কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ কষ্ট পেশ করা বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়)। অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলা বাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল---বেসবরী ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে তাঁর সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا (আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি)। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহে বিভিন্ন রূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হল।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আইউব (আ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হলঃ পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরনা দেখা দেবে। এই পানি

পান করুন এবং তা দ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইউব (আ) তদ্রূপই করলেন। ঝরনার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত-জর্জরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্তমাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করে আবর্জনার স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে এক পাশে বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন; কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এক পাশে উপবিষ্ট আইউব (আ)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন: আপনি জানেন কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুকুর ও ব্যাঘ্র কি তাকে খেয়ে ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে আইউব (আ) বললেন: আমিই আইউব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন: আপনি কি আমার সাথে পরিহাস করছেন? আইউব (আ) আবার বললেন: লক্ষ্য করে দেখ, আমিই আইউব। আল্লাহ্ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন: এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন।---(ইবনে-কাসীর)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন: হযরত আইউব (আ)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণেই জন্মগ্রহণ করে। একেই কোরআনে وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী বলেন: এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম।---(কুরতুবী)

কেউ কেউ বলেন: পূর্বে যতজন সন্তান ছিল, নতুন সন্তান ততজনই লাভ করলেন এবং তাদের মত সন্তান বলে সন্তানের সন্তান বোঝানো হয়েছে। والله اعلم

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾

(৮৫) এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী। (৮৬) আমি তাদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তারা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলের (কথা) স্মরণ করুন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন (শরীয়তগত ও সৃষ্টিগত বিধানাবলীতে) অটল। আমি তাঁদের (সবাই)-কে আমার (বিশেষ) রহমতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। নিশ্চয় তারা পূর্ণ সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যুলকিফল নবী ছিলেন, না ওলী? তাঁর বিস্ময়কর কাহিনী ঃ আলোচ্য আয়াত-দ্বয়ে তিনজন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল ও ইদরীস যে নবী ও রসূল ছিলেন, তা কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কোরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন যুলকিফল। ইবনে কাসীর বলেন ঃ তাঁর নাম দু'জন পয়গম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরদের কাতারভুক্ত ছিলেন না; বরং একজন সৎকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তফসীরবিদ ইবনে জারীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াসা' (যিনি পয়গম্বর ছিলেন বলে কোরআনে উল্লেখ আছে) বার্ধক্যে উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সব সাহাবীকে একত্রিত করে বললেন ঃ আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান আছে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই ঃ সদাসর্বদা রোযা রাখা, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোন সময় রাগান্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করত। সে বলল ঃ আমি এই কাজের জন্য উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সদাসর্বদা রোযা রাখ, ইবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোস্‌সা কর না? লোকটি বলল ঃ নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা সম্ভবত তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মত তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হল। তখন হযরত ইয়াসা তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখে শয়তান তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে বলল ঃ যাও, কোনরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্দরুন তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাঙ্গপাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল ঃ সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল ঃ তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুলকিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোযা রাখতেন

এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দ্বিপ্রহরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হল এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ কে? উত্তর হলঃ আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌঁছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই জুলুম করেছে, এই জুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুলকিফল বললেনঃ আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্য অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি মুকাদ্দমার ফয়সালা করার জন্য আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্য গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? উত্তর হলঃ আমি একজন বৃদ্ধ মজলুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেনঃ আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বললঃ হুযুর, আমার শত্রুপক্ষ খুবই ধূর্ত প্রকৃতির। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, তখন আবার অস্বীকার করে বসে। তিনি আবার বলে দিলেন যে, এখন যাও। আমি যখন মজলিসে বসি, তখন এসো। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হল না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না দেয়। বৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ করলে সে খিড়কীর পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুলকিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি ভেতরে ঢুকলে কিভাবে? তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেনঃ তা হলে তুমি আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বললঃ আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জালে আবদ্ধ হন নি। এখন আমি আপনাকে কোনরূপে রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা নবীর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুলকিফলের খেতাব দান করা হয়। 'যুলকিফল' শব্দের অর্থ অঙ্গীকার ও দায়িত্বপূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। —(ইবনে-কাসীর)

মসনদে আহমদে আরও একটি রেওয়ায়েত আছে; কিন্তু তাতে যুলকিফলের পরিবর্তে আলকিফল নাম বর্ণিত হয়েছে। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করার

পর বলেছেন, কিফল নামক এই ব্যক্তি অন্য কেউ হবে---আয়াতে বর্ণিত যুলকিফল নয়। রেওয়ায়েতটি এই ঃ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-উমর বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে একটি হাদীস একবার দুইবার নয়, সাতবারেরও বেশী শুনেছি। তিনি বলেন ঃ বনী-ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নাম ছিল কিফ্ল। সে কোন গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকত না। একবার জনৈকা মহিলা তার কাছে আগমন করলে সে ষাট দীনারের বিনিময়ে তাঁকে ব্যভিচারে সম্মত করে নিল। সে যখন কুকর্ম করতে উদ্যত হল, তখন মহিলাটি কাঁপতে লাগল ও কান্না জুড়ে দিল। সে বলল ঃ কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার ওপর কোন জোর-জবরদস্তি করছি? মহিলা বলল ঃ না, জবরদস্তি কর নি; কিন্তু আমি এই পাপকর্ম গত জীবনে কোনদিন করি নি। এখন অভাব-অনটন আমাকে তা করতে বাধ্য করেছে। তাই সম্মত হয়েছিলাম। একথা শুনে কিফ্ল তদবস্থায়ই মহিলার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল এবং বলল ঃ যাও, এই দীনারও তোমারই। এখন থেকে কিফ্ল আর কোনদিন পাপ কাজ করবে না। ঘটনাক্রমে সেদিন রাত্রেই কিফল মারা গেল। সকালে তার দরজায় অদৃশ্য থেকে কে যেন এই বাক্য লিখে দিল ঃ غفر الله للكفل অর্থাৎ আল্লাহ্ কিফ্লকে ক্ষমা করেছেন।

ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন ঃ এই রেওয়ায়েতটি সিহাহ্-সিত্তায় নেই। এই সনদ অপরিচিত। যদি একে প্রামাণ্যও ধরে নেয়া হয়, তবে এতে কিফ্লের কথা বলা হয়েছে---যুলকিফলের নয়। মনে হয় সে অন্য কোন ব্যক্তি। والله اعلم

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলকিফল হযরত ইয়াসা' নবীর খলীফা ও সৎকর্ম-পরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবত বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গম্বরগণের কাতারে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও অবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা' নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের পদও দান করেছিলেন।

وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ إِنِّيْ كُنْتُ
مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝٨٧ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ
نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨٨

(৮৭) এবং মাছওয়ালার কথা আলোচনা করুন; যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন ঃ তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি

নির্দোষ আমি গোনাহগার। (৮৮) অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবেই বিশ্বাসীদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং মাছওয়ালার (অর্থাৎ হযরত ইউনুস পয়গম্বরের) কথা আলোচনা করুন, যখন তিনি (বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে তাঁর সম্প্রদায়ের ওপর থেকে আযাব টলে যাওয়ার পরও ফিরে আসেন নি এবং এই সফরের জন্য আমার আদেশের অপেক্ষা করেন-নি) এবং তিনি (নিজের ইজতিহাদ দ্বারা) মনে করেছিলেন যে, আমি (এই চলে যাওয়ার ব্যাপারে) তাঁকে পাকড়াও করব না [অর্থাৎ এই পলায়নকে তিনি নিজের ইজ-তিহাদ দ্বারা বৈধ মনে করেছিলেন, তাই ওহীর অপেক্ষা করেন নি; কিন্তু যে পর্যন্ত আশা থাকে, সেই পর্যন্ত ওহীর অপেক্ষা করা পয়গম্বরগণের জন্য সমীচীন। এই সমীচীন কাজ তরক করার কারণে তাঁকে বিপদগ্রস্ত করা হয়। সেমতে পথিমধ্যে সমুদ্র পড়লে তিনি নৌকায় সওয়ার হন। নৌকা চলতে চলতে এক জায়গায় থেমে যায়। ইউনুস (আ)-এর বুঝতে বাকী রইল না যে, বিনা অনুমতিতে পলায়ন পছন্দ করা হয় নি। এ কারণেই নৌকা থেমে গেছে। তিনি নৌকার আরোহীদেরকে বললেনঃ আমাকে সমুদ্রে ফেলে দাও। তারা সম্মত হল না। লটারী করা হলে তাতেও তাঁরই নাম বের হল। অবশেষে তাঁকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হল। আল্লাহ্‌র আদেশে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। (দুর্‌রে মনসূর)] অতঃপর তিনি জমাট অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেনঃ [এক অন্ধকার ছিল মাছের পেটের, দ্বিতীয় সমুদ্রের পানির; উভয় গভীর অন্ধকার অনেক-গুলো অন্ধকারের সমতুল্য ছিল কিংবা তৃতীয় অন্ধকার ছিল রাত্রির। (দুর্‌রে মনসূর)] তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই (এটা তওহীদ), তুমি (সব দোষ থেকে) পবিত্র, (এটা পবিত্রতা বর্ণনা) আমি নিশ্চয়ই দোষী। (এটা ক্ষমা প্রার্থনা। এর উদ্দেশ্য আমার ত্রুটি মাফ করে এই সংকট থেকে মুক্তি দাও।) অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম এবং তাঁকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। (এই কাহিনী সূরা সাফফাতে فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।) আমি এমনিভাবে বিশ্বাসীদেরকে (দুশ্চিন্তা থেকে) মুক্তি দিয়ে থাকি (যদি কিছুকাল চিন্তাগ্রস্ত রাখা উপযোগী না হয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَذَا النُّونِ—হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আ)-র কাহিনী কোরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আম্বিয়া, সূরা সাফফাত ও সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুননূন' এবং কোথাও 'সাহেবুল হুত' উল্লেখ করা হয়েছে। 'নূন' ও 'হুত' উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুন-নূন ও সাহেবুল

হুতের অর্থ মাছওয়ালা। ইউনুস (আ) কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে যুন-নূনও বলা হয় এবং সাহেবুল হুত শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়।

ইউনুস (আ)-এর কাহিনী ঃ তফসীর ইবনে কাসীরে আছে, ইউনুস (আ)-কে মূসেলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হিদায়তের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সৎকর্মের দাওয়াত দেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আযাব এসেই যাবে (কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আযাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল)। অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুষ্পদ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের খাঁটি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেন। এ দিকে ইউনুস (আ) ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদৌ আযাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। (মাযহারী) এর ফলে ইউনুস (আ)-এর প্রাণনাশেরও আশংকা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে সামনে নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। মাঝিরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারি করা হল। ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আ)-এর নাম বের হল। (আরোহীরা বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হল। পুনরায় লটারি করা হল। এবারও ইউনুস (আ)-এর নামই বের হল। আরোহীরা তখনও দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারি করা হল। কিন্তু নাম ইউনুস (আ)-এরই বের হল। এই লটারির কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ অর্থাৎ লটারির ব্যবস্থা করা হলে ইউনুস (আ)-এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা সবুজ সাগরে এক মাছকে

আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস (আ)-কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আ)-এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয়। সে তার খাদ্য নয়; বরং তার উদর কয়েক দিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা। (ইবনে কাসীর) কোরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ্ তা'আলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি রোষে পতিত হন এবং তাঁকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

ইউনুস (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আযাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যত এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না; বরং আল্লাহ্র ওহীর কারণে ছিল। পয়গম্বরদের সনাতন রীতি অনুযায়ী সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যত আল্লাহ্র নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোন ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহ্র রোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন সম্প্রদায়ের খাঁটি তওবা ও কান্নাকাটি কবুল করে তাদের উপর থেকে আযাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজতিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলবে; বরং প্রাণনাশেরও আশংকা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ধর-পাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যদিও গোনাহ্ ছিল না; কিন্তু উত্তম পন্থার খেলাফ অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তা পছন্দ করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহ্র নৈকট্যশীলদের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। তাদের অভিরুচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটি হলেও তজ্জন্যে পাকড়াও করা হয়। এ কারণেই ইউনুস (আ) আল্লাহ্র রোষে পতিত হন।

তফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যত তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পরই ইউনুস (আ)-এর প্রতি রোষের এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে কয়েকদিন অবস্থান করাও আযাব দানের উদ্দেশ্যে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল; যেমন পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে; যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়। (কুরতুবী) ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার আয়াতসমূহে বর্ণিত শব্দাবলীর তফসীর দেখুন।

ذَهَبَ مُغَاضِبًا—অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যত এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। (ব

শব্দটিকে مغاضبا এর مفعول বলেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও مغاضبا لربه অর্থাৎ পালনকর্তার খাতিরে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন। কাফির ও পাপাচারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাৎ ঈমানের আলামত। ---(কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ---অভিধানের দিক দিয়ে نقدر শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যদি قدرت ধাতু থেকে উদ্ভূত হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না বলা বাহুল্য, এরূপ ধারণা কোন পয়গম্বর তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না; কারণ এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় এটা قدر ধাতু থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা; যেমন এক আয়াতে রয়েছে ঃ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে যুবায়র, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ এই অর্থই নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ) মনে করতেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, এটা তফসীরের অর্থে قدر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বিচারে রায় দেওয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস (আ) মনে করলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন ত্রুটি ধরা হবে না। কাতাদাহ্, মুজাহিদ, ফাররা প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

ইউনুস (আ)-এর দোয়া প্রত্যেকের জন্য, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্য মকবুল ঃ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ---অর্থাৎ আমি যেভাবে ইউনুস (আ)-কে দুশ্চিন্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মু'মিনকেও করে থাকি; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ---মাছের পেটে

কৃত ইউনুস (আ)-এর এই দোয়াটি যদি কোন মুসলমান কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করবেন।---(মাযহারী)

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ
الْوٰرِثِيْنَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهٗ
زَوْجَهٗ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا
وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ﴿٩٠﴾

(৮৯) এবং যাকারিয়ার কথা আলোচনা করুন, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করেছিল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস। (৯০) অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যাকারিয়া (আ)-র (কথা) আলোচনা করুন, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করেছিলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নিঃসন্তান রেখো না (অর্থাৎ আমাকে সন্তান দিন, যে আমার ওয়ারিস হবে) এবং (এমনিতে তো) ওয়ারিসদের মধ্য থেকে উত্তম (অর্থাৎ সত্যিকার ওয়ারিস) আপনিই (কাজেই সন্তানও সত্যিকার ওয়ারিস হবে না; বরং এক সময় সেও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এই বাহ্যিক ওয়ারিস দ্বারা কতিপয় ধর্মীয় উপকার হাসিল হবে। তাই তা প্রার্থনা করছি।) অতঃপর আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, তাঁকে দান করেছিলাম ইয়াহ্ইয়া (পুত্র) এবং তাঁর জন্য তাঁর (বন্ধ্যা) স্ত্রীকেও প্রসবযোগ্য করেছিলাম। (যে সমস্ত পয়গম্বরের কথা এই সূরায় উল্লেখ করা হল) তাঁরা সবাই সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, আশা ও ভীতি সহকারে আমার ইবাদত করতেন এবং আমার সামনে বিনীত হয়ে থাকতেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত যাকারিয়া (আ)-র একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন; কিন্তু সাথে সাথে أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ও বলে দিয়েছেন; অর্থাৎ পুত্র পাই বা না পাই; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিস। এটা পয়গম্বরসুলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন বৈ নয়। কারণ, পয়গম্বরদের আসল মনোযোগ

আল্লাহ্ তা'আলার দিকে থাকা উচিত। অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে নয়।

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا---তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকে। এর এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা ইবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কবুল ও সওয়াবের আশাও রাখে এবং স্বীয় গোনাহ ও ত্রুটির জন্য ভয়ও করে। ---(কুরতুবী)

وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩١﴾

(৯১) এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তার কামপ্রবৃত্তিকে বশে রেখেছিল, অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সেই নারীর (অর্থাৎ মারইয়ামের কথা) আলোচনা করুন, যিনি তাঁর সতীত্বকে (পুরুষদের কাছ থেকে) রক্ষা করেছিলেন (বিবাহ থেকেও এবং অবৈধ সম্পর্ক থেকেও)। অতঃপর আমি তার মধ্যে (জিবরাঈলের মধ্যস্থতায়) আমার রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম (ফলে স্বামী ছাড়াই তার গর্ভ সঞ্চার হয়) এবং তাকে ও তার পুত্র [ঈসা (আ)]-কে বিশ্ববাসীর জন্য (আমার কুদরতের) নিদর্শন করেছিলাম [যাতে তাকে দেখেশুনে তারা বুঝে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি পিতা ছাড়াও সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন এবং পিতামাতা ছাড়াও পারেন; যেমন আদম (আ)।]

اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۭ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ﴿٩٤﴾ وَحَرٰمٌ عَلٰي قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٩٥﴾ حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ﴿٩٦﴾ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ

الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا
قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾ إِنَّكُمْ وَمَا
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴿٩٨﴾
لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ
فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم
مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا
وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ
الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي
الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

(৯২) তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার বন্দেগী কর। (৯৩) এবং মানুষ তাদের কার্যকলাপ দ্বারা পারস্পরিক বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৯৪) অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। (৯৫) যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত; (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফিরদের চক্ষু উচ্চে স্থির হয়ে যাবে; হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বেখবর ছিলাম; বরং আমরা গোনাহ্গারই ছিলাম। (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো দোযখের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। (৯৯) এই মূর্তিরা যদি উপাস্য হত, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। (১০০) তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই

শুনতে পাবে না। যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোযখ থেকে দূরে থাকবে। (১০২) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে। (১০৩) মহা ত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবেঃ আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। (১০৪) সে দিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যে ভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। (১০৫) আমি উপদেশের পর যবূরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্ম-পরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(**পূর্বাপর সম্বন্ধ**ঃ এ পর্যন্ত পয়গম্বরদের কাহিনী, ঘটনাবলী এবং অনেক আনুষঙ্গিক মৌলিক ও শাখাগত রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। তওহীদ, রিসালত, পরকালের বিশ্বাস ইত্যাদি মূলনীতি সব পয়গম্বরদের মধ্যে অভিন্ন। এগুলো তাদের দাওয়াতের ভিত্তি। উল্লিখিত ঘটনাবলীতে পয়গম্বরগণের প্রচেষ্টার মূলকেন্দ্র ছিল তওহীদের বিষয়বস্তু। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাহিনীসমূহের ফলাফল হিসেবে তওহীদ প্রমাণ করা হয়েছে এবং শিরকের নিন্দা করা হয়েছে।)

লোকসকল, (উপরে পয়গম্বরদের যে তরীকা ও তওহীদী বিশ্বাস জানা গেল,) এটা তোমাদের তরীকা (যা মেনে চলা তোমাদের উপর ওয়াজিব।)— একই তরীকা (এতে কোন নবী ও কোন শরীয়তের মতভেদ নেই। এই তরীকার সারমর্ম এই যে,) আমি তোমাদের পালনকর্তা, অতএব আমার ইবাদত কর এবং (যখন এটা প্রমাণিত যে, সব আল্লাহ্‌র গ্রন্থ এবং সব শরীয়ত এই তরীকার প্রবর্তক, তখন লোকদেরও এই তরীকায় থাকা উচিত ছিল; কিন্তু তা হয়নি; বরং মানুষ তাদের ধর্ম বিষয়ে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। (তারা এর শাস্তি দেখে নেবে; কেননা) প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে (প্রত্যাবর্তনের পর প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে)। অতঃপর যে বিশ্বাসী অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করবে, তার পরিশ্রম বিফলে যাবে না এবং আমি তা লিখে রাখি (এতে ভুলভ্রান্তির আশংকা নেই। এই লেখা অনুযায়ী প্রত্যেকেই সওয়াব পাবে)। আর (সবাই আমার কাছে ফিরে আসবে—আমার এই কথায় অবিশ্বাসীরা সন্দেহ করে বলে যে, দুনিয়ার এত দীর্ঘ বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত কোন মৃতকে জীবিত হতে এবং তার হিসাব-নিকাশ হতে দেখিনি। তাদের এ সন্দেহ অমূলক। কেননা, আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য কিয়ামতের দিন নির্দিষ্ট আছে। সে দিনের পূর্বে কেউ প্রত্যাবর্তন করবে না। এ কারণেই) আমি যেসব জনপদকে (আযাব অথবা মৃত্যু দ্বারা) ধ্বংস করে দিয়েছি, সেগুলোর অধিবাসীদের জন্য এটা (শরীয়তগত অসম্ভাব্যতার অর্থে) অসম্ভব যে, তারা (দুনিয়াতে হিসাব-নিকাশের জন্য) ফিরে আসবে (কিন্তু এই ফিরে না আসা চিরকালীন নয়; বরং

প্রতিশ্রুত সময় অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত।) যে পর্যন্ত না (ঐ প্রতিশ্রুত সময় আসবে, যার প্রাথমিক আয়োজন হবে এই যে,) ইয়াজুজ-মাজুজ (যাদের পথ এখন যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা রুদ্ধ আছে,) মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারা (সংখ্যাধিক্যের কারণে) প্রত্যেক উচ্চভূমি (টিলা ও পাহাড়) থেকে অবতরণরত (মনে) হবে। আর (আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের সত্য প্রতিশ্রুত সময়) নিকটবর্তী হলে এমন অবস্থা হবে যে, অবিশ্বাসীদের চক্ষু বিস্ফারিত থেকে যাবে (এবং তারা বলতে থাকবে), হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য; আমরা এ বিষয়ে বে-খবর ছিলাম (এরপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলবে, একে তো তখন গাফিলতি বলা যেত, যখন আমাদেরকে কেউ সতর্ক না করত) বরং (সত্য এই যে,) আমরাই দোষী ছিলাম। (সারকথা এই যে, যারা কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস করত, তারাও তখন তাতে বিশ্বাসী হয়ে যাবে। এরপর মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে ঃ) নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করছ, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে (এবং) তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (কোন কোন মুশরিক যেসব পয়গম্বর ও ফেরেশতাকে দুনিয়াতে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তাঁরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় ; কেননা, তাঁদের ক্ষেত্রে একটি শরীয়তসম্মত অন্তরায় আছে যে, তারা জাহান্নামের যোগ্য নয় এবং এ ব্যাপারে তাঁদের কোন দোষও নেই। পরবর্তী إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ আয়াতেও এই সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। এটা বোঝার বিষয় যে,) যদি তারা (মূর্তিরা) বাস্তবিকই উপাস্য হত, তবে তাতে (জাহান্নামে) প্রবেশ করত না (প্রবেশও ক্ষণস্থায়ী নয়; বরং) প্রত্যেকেই (পূজাকারী ও পূজিত) তাতে চিরকাল বাস করবে। তারা তথায় চীৎকার করবে এবং (হট্টগোলের কারণে) তথায় তারা কারও কোন কথা শুনবে না। (এ হচ্ছে জাহান্নামীদের অবস্থা এবং) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে পুণ্য অবধারিত হয়ে গেছে, (এবং তা তাদের কাজে-কর্মে প্রকাশ পেয়েছে) তারা জাহান্নাম থেকে (এতটুকু দূরে) থাকবে (যে) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না। (কেননা, তারা জান্নাতে থাকবে। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকবে।) তারা তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহের মধ্যে চিরবসবাস করবে। তাদেরকে মহাত্রাস (অর্থাৎ কিয়ামতে জীবিত হওয়া এবং হাশরের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী) চিন্তান্বিত করবে না এবং (কবর থেকে বের হওয়া মাত্রই) ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে। (তারা বলবে ঃ) আজ তোমাদের ঐ দিন, যেদিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (এই সম্মান ও সুসংবাদের ফলে তাদের আনন্দ ও প্রফুল্লতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের গ্রাস ও ভীতি থেকে কেউ মুক্ত থাকবে না---সবাই এর সম্মুখীন হবে। যেহেতু সৎ বান্দারা খুব কম সময়ের জন্য এর সম্মুখীন হবে, তাই সম্মুখীন না হওয়ারই শামিল।) ঐ দিনটিও স্মরণীয়, যেদিন আমি (প্রথম ফুঁৎকারের পর) আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নেব, যেমন লিখিত বিষয়বস্তুর কাগজপত্রকে গুটানো হয়। (গুটানোর পর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া অথবা দ্বিতীয় ফুঁৎকার পর্যন্ত তদবস্থায় রেখে দেওয়া উভয়টি সম্ভবপর।) আমি যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করার

সময় (প্রত্যেক বস্তুর) সূচনা করেছিলাম, তেমনি (সহজেই) তাকে পুনরায় সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা, আমি অবশ্যই (একে পূর্ণ) করব। (উপরে সৎ বান্দাদেরকে যে সওয়াব ও নিয়ামতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত প্রাচীন ও জোরদার ওয়াদা। সেমতে) আমি (সব আল্লাহ্‌র) গ্রন্থসমূহে (লওহে মাহ্‌ফুযে লেখার পর) লিখে দিয়েছি যে, এই পৃথিবীর (অর্থাৎ জান্নাতের) মালিক আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ হবে। (এই ওয়াদার প্রাচীনত্ব এভাবে পরিস্ফুট যে, এটা লওহে মাহ্‌ফুযে লিখিত আছে এবং জোরদার হওয়া এভাবে বোঝা যায় যে, কোন আল্লাহ্‌র গ্রন্থ এ ওয়াদা থেকে খালি নয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ---এখানে 'হারাম' শব্দটি 'শরীয়তগত অসম্ভব'-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অসম্ভব'।

لَا يَرْجِعُونَ---বাক্যে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে لَا অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্য পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোন কোন তফসীরবিদ حرام শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরী অর্থে ধরে لا কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্য দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরী।---(কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সৎকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কিয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

---এখানে حتى শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ্ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম ঃ আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন ঃ যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ

না পায়, সেই পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্য فتحت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ্ তা'আলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। কোরআন পাক থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কিয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম হবে। সূরা কাহ্ফে ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার।

حدب---শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি---বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা কাহ্ফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ পর্বতমালার পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তরদিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়ে পড়তে দেখা যাবে।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ---অর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফিরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ ইবাদত তো হযরত ঈসা (আ), হযরত ওযায়র (আ) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? তফসীরে কুরতুবীর এক রেওয়ায়েতে এই প্রশ্নের জওয়াব প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। জানি না, সন্দেহের জওয়াব তাদের জানা আছে, এ কারণে জিজ্ঞাসা করে না, না তারা সন্দেহ ও জওয়াবের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না! লোকেরা আরয করল ঃ আপনি কোন্ আয়াতের কথা বলছেন? তিনি বললেন ঃ আয়াতটি হলো এই ঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ---এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের বিতৃষ্ণার অবধি থাকেনি। তারা বলতে থাকে ঃ এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী আলিম) ইবনে যবআরীর কাছে পৌঁছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন ঃ আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমুচিত জওয়াব দিতাম। আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কি জওয়াব দিতেন? তিনি বললেন ঃ আমি বলতাম যে, খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-এর এবং ইহুদীরা হযরত ওযায়র (আ)-এর ইবাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি বলেন? (নাউযুবিল্লাহ্)

তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? কাফিররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হল যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ এ কথার কোন জওয়াব দিতে পারবেন না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা—

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে।

এই ইবনে যবআরী সম্পর্কেই কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল হয়েছিল ঃ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ—অর্থাৎ যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ—হযরত ইবনে আব্বাস বলেন ঃ فزع اكبر (মহাত্রাস) বলে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্য উত্থিত হবে। কারও কারও মতে শিঙ্গার প্রথম ফুঁৎকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন ঃ শিঙ্গায় তিনবার ফুঁৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকার হবে ত্রাসের ফুঁৎকার। এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। আয়াতে একেই فزع اكبر বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুঁৎকার হবে বজ্রের ফুঁৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে এবং সবকিছু কানা হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুঁৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুঁৎকার। এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে মসনদে আবূ ইয়ালা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে হযরত আবূ হুরায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে।—(মাযহারী) والله اعلم

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ—হযরত ইবনে আব্বাস سجل শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ, কাতাদাহ্ প্রমুখও এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। كتب শব্দের অর্থ এখানে مكتوب অর্থাৎ লিখিত। আয়াতের অর্থ এই যে, কোন সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশমণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। (ইবনে কাসীর, রূহুল মা'আনী) سجل সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা কোন ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদদের কাছে এই রেওয়ায়েত

গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশ-মণ্ডলীকে গুটিয়ে নিজের হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্ট বস্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অন্তর্বর্তী সব সৃষ্ট বস্তুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ্ তা'আলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে।---(ইবনে কাসীর)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ

الصّٰلِحُوْنَ---زبور শব্দটি زبر-এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে زبور বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে আছে, আয়াতে ذكر বলে তওরাত এবং زبور বলে তওরাতের পর অবতীর্ণ আল্লাহ্র গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে; যথা ইন্‌জীল, যবুর ও কোরআন।---(ইবনে জরীর) যাহ্হাক থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যায়দ বলেনঃ ذكر বলে লওহে মাহ্ফুয এবং زبور বলে পয়গম্বরদের প্রতি অবতীর্ণ সকল আল্লাহ্র গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। যাজ্জাজ এ অর্থই পছন্দ করেছেন।---(রূহুল মা'আনী)

اَلْاَرْضَ---সাধারণ তফসীরবিদদের মতে এখানে ارض (পৃথিবী) বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবায়র, ইকরামা, সুদ্দী, আবুল আলিয়া থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রাযী বলেনঃ কোরআনের অন্য আয়াত এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ

অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জান্নাতের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মু'মিন-কাফির সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সৎকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কিয়ামতের আলোচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কিয়ামতের পর জান্নাতের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই। ইবনে আব্বাসের অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, ارض এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী---অর্থাৎ দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জান্নাতের পৃথিবীও। (জান্নাতের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সৎকর্মপরায়ণগণ

হবে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। তবে এক সময়ে তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ---পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্যই। অপর এক আয়াতে আছে---وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ মু'মিন ও সৎকর্মীদেরকে আল্লাহ্‌ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের পৃথিবীতে খলীফা করবেন। আরও এক আয়াতে আছেঃ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ---নিশ্চয় আমি আমার পয়গম্বরগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সৎকর্ম-পরায়ণেরা একবার পৃথিবীর বৃহদাংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। মেহদী (আ)-র যমানায় আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।---(রূহুল মা'আনী, ইবনে কাসীর)

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾
قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَهَلْ أَنتُم
مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ
أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ
مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ
الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾

(১০৬) এতে ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্য পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে। (১০৭) আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। (১০৮) বলুন ঃ আমাকে তো এ আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আজ্ঞাবহ হবে? (১০৯) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন ঃ "আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করেছি এবং আমি জানি না তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী। (১১০) তিনি জানেন যে কথা সশব্দে বল এবং যে কথা তোমরা গোপন কর। (১১১) আমি জানি না সম্ভবত বিলম্বের মধ্যে তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং এক সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ।' (১১২) পয়গম্বর বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি ন্যায়ানুগ ফয়সালা করে দিন। আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ কোরআনে অথবা এর খণ্ডাংশে তথা উল্লিখিত সূরায়) পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে, তাদের জন্য---যারা ইবাদতকারী। (পক্ষান্তরে যারা ইবাদত ও আনুগত্যে বিমুখ, এটা তাদের জন্যও হেদায়েত; কিন্তু তারা হেদায়েত চায় না। তাই এর উপকারিতা থেকে বঞ্চিত।) আমি আপনাকে অন্য কোন বিষয়ের জন্য (রসূল করে) প্রেরণ করিনি; কিন্তু বিশ্বজগতের প্রতি (আপন) অনুগ্রহ করার জন্য। সেই অনুগ্রহ এই যে, বিশ্ববাসী রসূলের কাছ থেকে এসব বিষয়বস্তু গ্রহণ করে হেদায়েতের ফল ভোগ করবে। কেউ গ্রহণ না করলে সেটা তার দোষ। এতে এসব বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা ক্ষুণ্ণ হয় না।) আপনি তাদেরকে (সারমর্ম হিসেবে পুনরায়) বলে দিন ঃ আমার কাছে তো (একত্ববাদী ও অংশীবাদীদের পারস্পরিক মতভেদ সম্পর্কে) এ ওহীই এসেছে যে, তোমাদের উপাস্য একই উপাস্য। সুতরাং (তাঁর সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর) এখনও তোমরা মানবে কি না? (অর্থাৎ এখন তো মেনে নাও।) অতঃপর যদি তারা (তা মানতে) বিমুখ হয়, তবে আপনি (যুক্তি পূর্ণ করার মানসে) বলে দিন ঃ আমি তোমাদের পরিষ্কার সংবাদ দিয়েছি (এতে বিন্দুপরিমাণও গোপনীয়তা নেই। তওহীদ ও ইসলামের সত্যতার সংবাদও দিয়েছি এবং অস্বীকার করলে শাস্তির কথাও পুরোপুরি বর্ণনা করেছি। এখন আমার উপর সত্য প্রচারের দায়িত্বও নেই এবং তোমাদেরও ওযর পেশ করার অবকাশ নেই) এবং (যদি শাস্তি না আসার কারণে তোমরা এর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ কর, তবে বুঝে নেয়া দরকার যে, শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু) আমি জানি না, তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী, না দূরবর্তী। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সশব্দে বলা কথাও জানেন এবং যা তোমরা গোপনে বল, তাও জানেন। (আযাবের বিলম্ব দেখে তা বাস্তবায়িত হবে না বলে ধোঁকা খেয়ো না। কোন উপকারিতা ও রহস্যের কারণে বিলম্ব হচ্ছে।) আমি জানি না (সেই উপকারিতা কি, হ্যাঁ, এতটুকু বলতে পারি যে, সম্ভব (আযাবের এই বিলম্ব) তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা (যে,

বোধ হয় সতর্ক হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করবে) এবং এক (সীমিত) সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ (যে গাফিলতি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আযাবও বৃদ্ধি পাবে। প্রথম ব্যাপারটি অর্থাৎ পরীক্ষা একটি রহমত এবং দ্বিতীয় ব্যাপার অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু ও সুযোগ সুবিধা দান একটি শাস্তি। যখন এসব বিষয়বস্তু দ্বারা হেদায়েত হল না, তখন) পয়গম্বর (সা) বলেনঃ হে আমার পালনকর্তা (আমার ও আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে) ফয়সালা করে দিন (যা সর্বদা) ন্যায়ের অনুকূল (হয়। উদ্দেশ্য এই যে, কার্যত ফয়সালা করে দিন অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে কৃত সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা পূর্ণ করুন। রসূল আরও বললেন) আমাদের পালনকর্তা দয়াময়, তোমরা যা বলছ (অর্থাৎ মুসলমানরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে) তিনি সে বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার যোগ্য (আমরা তোমাদের মুকাবিলায় এই দয়াময় পালনকর্তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ—عالمين শব্দটি عالم এর বহু বচন। মানব, জ্বিন, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ (সা) সবার জন্যই রহমতস্বরূপ ছিলেন। কেননা, আল্লাহ্‌র যিকর ও ইবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্ট জগতের সত্যিকার রূহ্। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই রূহ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কিয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র যিকর ও ইবাদত সব বস্তুর রূহ্, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব বস্তুর জন্য রহমতস্বরূপ, তা আপনা আপনি ফুটে উঠল। কেননা, দুনিয়াতে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র যিকর ও ইবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ انا رحمة مهداة আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত। (ইবনে আসাকির) হযরত ইবনে উমরের বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেনঃ انا رحمة مهداة برفع قوم وخفض اخرين অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ প্রেরিত রহমত, যাতে (আল্লাহ্‌র আদেশ পালনকারী) এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি এবং (আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্যকারী) অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই।—(ইবনে কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শিরককে নিশ্চিহ্ন করার জন্য কাফিরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মুকাবিলায় জিহাদ করাও সাক্ষাৎ রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবাধ্যদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সৎকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে। والله سبحانه وتعالى اعلم

سورة الحج

সূরা হজ্জ

মদীনায় অবতীর্ণ, ১০ রুকূ, ৭৮ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ①

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ

ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى

وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ①

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয়; বস্তুত আল্লাহ্‌র আযাব সুকঠিন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর (এবং ঈমান ও ইবাদত অবলম্বন কর। কেননা,) নিশ্চিতভাবেই কিয়ামতের ভূকম্পন অত্যন্ত সাংঘাতিক ব্যাপার। (এর আগমন অবশ্যম্ভাবী। সেদিনের বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা এখনই কর। এর উপায় আল্লাহ্‌ভীতি। অতঃপর এই ভূকম্পনের কঠোরতা বর্ণিত হচ্ছে ঃ) যেদিন তোমরা তা (অর্থাৎ ভূকম্পনকে) প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন (এই অবস্থা হবে যে,) প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী (ভীতি ও আতংকের কারণে) তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভ (দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই) পাত করবে এবং তুমি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) মানুষকে দেখবে মাতাল; অথচ তারা নেশাগ্রস্ত হবে না (কেননা, সেখানে কোন নেশার বস্তু ব্যবহার করার আশংকা নেই)। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাবই কঠিন ব্যাপার (যার ভীতির কারণে তাদের অবস্থা মাতাল সদৃশ হয়ে যাবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ না মদীনায় অবতীর্ণ, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ বলেন ঃ এই সূরাটি মিশ্র। এতে মক্কায় অবতীর্ণ ও মদীনায় অবতীর্ণ উভয় প্রকার আয়াতের সমাবেশ ঘটেছে। কুরতুবী এ উক্তিকেই বিশুদ্ধতম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন ঃ এই সূরার কতিপয় বৈচিত্র্য এই যে, এর কিছু আয়াত রাতে, কিছু দিনে, কিছু সফরে, কিছু গৃহে অবস্থানকালে, কিছু মক্কায়, কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধাবস্থায় ও কিছু শান্তিকালে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু মুহ্‌কাম তথা সুস্পষ্ট ও কিছু মুতাশাবিহ তথা অস্পষ্ট। সূরাটিতে অবতরণের সব প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ---সফর অবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলে করীম (সা) উচ্চৈঃস্বরে এর তিলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে-কেরাম তাঁর আওয়াজ শুনে এক জায়গায় সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন ঃ এই আয়াতে উল্লেখিত কিয়ামতের ভূকম্পন কোন্ দিন হবে তোমরা জান কি? সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সম্বোধন করে বলবেন ঃ যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম (আ) জিজ্ঞেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বললেন ঃ এই সময়েই ত্রাস ও ভীতির আতিশয্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে-কেরাম একথা শুনে ভীত-বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেন ঃ তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। এই বিষয়বস্তু সহীহ্ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে আবূ সায়ীদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজুজ-মাজুজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায় (তাই নয়শত নিরানব্বই এর-মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যা তাদেরই হবে)। তফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে ঃ কিয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কিয়ামতের

সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কোরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে ; যথা (১) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ (২) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا —ইত্যাদি। কেউ (৩) وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً —إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا কেউ আদম (আ)-কে সম্বোধন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই যে, উভয় উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কিয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। والله اعلم

কিয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কিয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটার ব্যাপারে কোন খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কিয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনি-ভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে।—(কুরতুবী)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ
مَّرِيْدٍ ۙ كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ
اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ
الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۭ وَنُقِرُّ
فِي الْاَرْحَامِ مَا نَشَاۗءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ
يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـــًٔا ۭ وَتَرَى

الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَ
اَنَّهٗ يُحْىِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَّاَنَّ السَّاعَةَ
اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ۝ وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ
مُّنِيْرٍ ۝ ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ لَهٗ فِى الدُّنْيَا
خِزْىٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ
يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

(৩) কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। (৪) শয়তান সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পরিচালিত করবে। (৫) হে লোক সকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ---) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃ-গর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (৬) এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (৭) এবং এ কারণে যে, কিয়া-মত অবশ্যম্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। (৮) কতক মানুষ জ্ঞান, প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে। (৯) সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং কিয়ামতের দিন আমি

তাকে দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করাব। (১০) এটা তোমার দুই হাতের কর্মের কারণে যে, আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং কতক মানুষ আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলী সম্পর্কে) অজ্ঞানতাবশত বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে (অর্থাৎ পথভ্রষ্টতার এমন যোগ্যতা রাখে যে, যে শয়তান যেভাবে তাকে প্ররোচিত করে, সে তার প্ররোচনার জালে পড়ে যায়। কাজেই সে চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্ট, তাকে প্রত্যেক শয়তানই পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে)। শয়তান সম্পর্কে (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) লিখে দেওয়া হয়েছে (এবং নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে) যে, যে কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখবে (অর্থাৎ তার অনুসরণ করবে), সে তাকে (সৎপথ থেকে) বিপথগামী করবে এবং দোযখের আযাবের দিকে পথ দেখাবে। (অতঃপর বিতর্ককারীদেরকে বলা হচ্ছে) লোক সকল! যদি তোমরা (কিয়ামতের দিন) পুনরায় জীবিত হওয়ার (সম্ভাব্যতা) সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হও, তবে (পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর, যাতে সন্দেহ দূর হয়ে যায়। বিষয়বস্তু এই) আমি (প্রথমবার) তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি (কেননা, যে খাদ্য থেকে বীর্য উৎপন্ন হয়, তা প্রথমে উপাদান চতুষ্টয় থেকে তৈরী হয়, যার এক উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা।) এরপর বীর্য থেকে (যা খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়) এরপর জমাট রক্ত থেকে (যা বীর্যে ঘনত্ব ও লালিমা দেখা দিলে অর্জিত হয়) এরপর মাংসপিণ্ড থেকে (যা জমাট রক্ত কঠিন হলে অর্জিত হয়) কতক পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং কতক অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্টও হয়। (এরকম গঠন, পর্যায়ক্রম ও পার্থক্য সহকারে সৃষ্টি করার কারণ এই যে,) যাতে আমি তোমাদের সামনে (আমার কুদরত) ব্যক্ত করি (এটাই পুনরায় সৃষ্টি করার স্বতঃস্ফূর্ত প্রমাণ। এই বিষয়বস্তুর একটি পরিশিষ্ট আছে, যদ্দ্বারা আরও বেশী কুদরত ব্যক্ত হয়। তা এই যে,) আমি মাতৃগর্ভে যা (অর্থাৎ যে বীর্য)-কে ইচ্ছা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য (অর্থাৎ প্রসবের সময় পর্যন্ত) রেখে দেই (এবং যাকে রাখতে চাই না, তার গর্ভপাত হয়ে যায়)। এরপর (অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের পর) আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় (জননীর গর্ভ থেকে) বাইরে আনি। এরপর (তিন প্রকার হয়ে যায়। এক প্রকার এই যে, তোমাদের কতককে যৌবন পর্যন্ত সময় দেই যাতে) তোমরা পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ যৌবনের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় (এটা দ্বিতীয় প্রকার) এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স (অর্থাৎ চূড়ান্ত বার্ধক্য) পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে এক বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ার পর আবার অজ্ঞান হয়ে যায় (যেমন অধিকাংশ বৃদ্ধকে দেখা যায় যে, এইমাত্র এক কথা বলার পরক্ষণেই তা জিজ্ঞাসা করে। এটা তৃতীয় প্রকার। এসব অবস্থাও আল্লাহ্ তা'আলার মহান শক্তির নিদর্শন। এ পর্যন্ত এক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে। হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি ভূমিকে শুষ্ক (পতিত) দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সজীব ও স্ফীত হয়ে

যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে (এটাও আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের প্রমাণ। অতঃপর প্রমাণকে আরও ফুটিয়ে তোলার জন্য উল্লেখিত কর্মসমূহের কারণ ও রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে) এগুলো (অর্থাৎ উপরে দুইটি প্রমাণ বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত বস্তুসমূহের যা কিছু সৃষ্টি ও প্রকাশ বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো) একারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা স্বয়ং সম্পূর্ণ (এটা তাঁর সত্তাগত পূর্ণতা) এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন (এটা তাঁর কর্মগত পূর্ণতা।) এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান (এটা তার গুণগত পূর্ণতা। এই তিনটির সমষ্টি উল্লিখিত সৃষ্টি ও প্রকাশের কারণ। কেননা পূর্ণতা ত্রয়ের মধ্যে যদি একটিও অনুপস্থিত থাকত, তবে আবিষ্কার সম্ভব হত না।) এবং এ কারণে যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। এতে সামান্যও সন্দেহ নাই এবং কবরে যারা আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। (এটা উল্লিখিত সৃষ্টি ও প্রকাশের রহস্য। অর্থাৎ উল্লিখিত সৃষ্টিসমূহ প্রকাশ করার কারণ এই যে, এতে অন্যান্য রহস্যের মধ্যে এক রহস্য এই ছিল যে, আমি কিয়ামত সংঘটিত করতে এবং মৃতদেরকে জীবিত করতে চেয়েছিলাম। এগুলোর সম্ভাব্যতা উপরোক্ত কর্মসমূহের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিতে ফুটে উঠবে। সুতরাং উপরোক্ত বস্তুসমূহ সৃষ্টির তিনটি কারণ ও দুইটি রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং ব্যাপক অর্থে সবগুলোই কারণ। তাই بِاَنَّ اللّٰهَ বাক্যে باء سببية সবগুলোর আগেই সংযুক্ত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিতর্ককারীদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করে তা প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টকরণ অর্থাৎ অপরকে পথভ্রষ্ট করা সহ উভয় পথভ্রষ্টতা ও পথভ্রষ্টকরণের অভিশাপ বর্ণিত হচ্ছে। কতক লোক আল্লাহ্ সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর সত্তা, গুণাবলী অথবা কর্ম সম্পর্কে) জ্ঞান (অর্থাৎ অপ্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান) ছাড়াই এবং উজ্জ্বল কিতাব (অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রমাণসাপেক্ষ জ্ঞান) ছাড়াই (এবং অন্যান্য বিচক্ষণ লোকদের অনুসরণ ও অনুকরণের প্রতি) দম্ভ প্রদর্শন করে বিতর্ক করে, যাতে (অন্যদেরকেও) আল্লাহ্র পথ থেকে (অর্থাৎ সত্য ধর্ম থেকে) বিপথগামী করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে। (যে ধরনের লাঞ্ছনাই হোক। সেমতে কতক বিপথগামী নিহত ও কয়েদী হয়ে লাঞ্ছিত হয় এবং কতক সত্যপন্থীদের কাছে বিতর্কে পরাজিত হয়ে জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে হেয় হয়।) এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের আযাব আস্বাদন করাব। (তাকে বলা হবেঃ) এটা তোমার স্বহস্তকৃত কর্মের প্রতিফল এবং এটা নিশ্চিতই যে আল্লাহ্ (তার) বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না (সুতরাং তোমাকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয়নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ---এই আয়াত কট্টর বিতর্ক-কারী নযর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা

এবং কোরআনকে বিগত লোকদের কল্পকাহিনী বলত। কিয়ামতে পুনরুত্থানও সে অস্বীকার করত। ---(মাযহারী)

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম এ ধরনের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যাপক।

মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা ঃ فَاِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ تُرَابٍ

---এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মানুষের বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরও চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ্ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয় ঃ ১. তার বয়স কত হবে, ২. সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে, ৩. সে কি কি কাজ করবে এবং ৪. পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা। ---(কুরতুবী)

আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদেরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বীর্য যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করে ঃ يا رب مخلقة او غير مخلقة অর্থাৎ এই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কি না? যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় غير مخلقة তবে গর্ভাশয় সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে দেয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জওয়াবে مخلقة বলা হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে, ছেলে না কন্যা, হতভাগা, না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে এবং কোথায় মৃত্যু বরণ করবে? এসব প্রশ্নের জওয়াব তখনই ফেরেশতাকে বলে দেয়া হয়।---(ইবনে কাসীর) مخلقة ও غير مخلقة শব্দদ্বয়ের এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে।---(কুরতুবী)

مخلقة وغير مخلقة ----উল্লিখিত হাদীস থেকে এই শব্দদ্বয়ের তফসীর এই জানা গেল যে, যে বীর্য দ্বারা মানব সৃষ্টি অবধারিত হয়, তা مخلقة এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা غير مخلقة ----কোন কোন তফসীরকার مخلقة ও غير مخلقة -এর এরূপ তফসীর করেন যে, যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুষম হয়, সে مخلقة অর্থাৎ পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ

অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন, বর্ণ ইত্যাদি অসম, সে مخلقة —তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই তফসীরই নেওয়া হয়েছে। والله اعلم

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا---অর্থাৎ অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ইন্দ্রিয়, জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং পরিশেষে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌঁছে যায়। ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ---এর অর্থ তাই। أشد শব্দটি شدة এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমিক উন্নতির ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যক্ষ করা হয়।

أَرْذَلِ الْعُمُرِ---সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ত্রুটি দেখা যায়। রসূলে করীম (সা) এমন বয়স থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সা'দের বাচনিক নাসায়ীতে বর্ণিত আছে ---রসূলুল্লাহ্ (সা) নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে করতেন এবং সা'দ (রা)-ও এই দোয়া তাঁর সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰی اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْیَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা ঃ মসনদে আহ্‌মদ ও মসনদে আবূ ইয়ালায় বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেকের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সৎকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন সন্তান অসৎকর্ম করলে তা তার নিজের আমলনামায়ও লেখা হয় না এবং পিতামাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হিফাযত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্য সঙ্গীয় দুইজন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে উন্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও ধবলকুষ্ঠ---এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর

বয়সে পেঁ ৗছে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট বছর বয়সে পৌঁছলে সে আল্লাহ্র দিকে রুজুর তওফীক প্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌঁছলে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ্ তা'আলা তার সৎকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসৎকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ্ তা'আলা তার অগ্রপশচাতের সব গোনাহ্ মাফ করে দেন এবং তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফায়াত করার অধিকার দান করেন ও শাফায়াত কবূল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায় 'আমিনুল্লা ও আমিরুল্লাহ্ ফিল আরয' অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ্র বন্দী। (কেননা, এই বয়সে সাধা-রণত মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোন কিছুতে ঔৎসুক্য বাকী থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন-যাপন করে)। অতঃপর মানুষ যখন 'আরযালে ওমর' তথা নিষ্কর্মা বয়সে পেঁ ৗছে যায়, তখন সুস্থ ও শক্তিমান অবস্থায় যেসব সৎকর্ম করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লেখা হয় এবং কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

হাফেয ইবনে কাসীর এই রেওয়ায়েতটি মসনদে আবূ ইয়ালা থেকে উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة شديدة অর্থাৎ হাদীসটি অবিদিত এবং এতে ঘোর আপত্তির কারণ নিহিত আছে। এরপর তিনি বলেন ঃ

ومع هذا رواه الامام احمد فى مسنده موقوفا ومرفوعا অর্থাৎ এতদ-সত্ত্বেও ইমাম আহ্মদ ইবনে হাম্বল হাদীসটিকে 'মওকুফ ও মরফূ' উভয় প্রকারে তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনে কাসীর মসনদে আহমদ থেকে উভয় প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় তাই, যা মসনদে আবূ ইয়ালা থেকে উপরে বর্ণিত হয়েছে। والله اعلم

ثَانِىَ عِطْفِهٖ - শব্দের অর্থ পার্শ্ব। অর্থাৎ পার্শ্ব পরিবর্তনকারী। এখানে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বোঝানো হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ ۨ
اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ ۨ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿١١﴾ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوْا
لَمَنْ ضَرُّهٗۤ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ ؕ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ ﴿١٣﴾

(১১) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের ওপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (১২) সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, সে তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পথভ্রষ্টতা। (১৩) সে এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌঁছে। কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত (এমনভাবে) করে (যেমন কেউ কোন বস্তুর) কিনারায় (দণ্ডায়মান থাকে এবং সুযোগ পেলে চম্পট দিতে প্রস্তুত থাকে)। অতঃপর যদি সে কোন (পার্থিব) মঙ্গল প্রাপ্ত হয়, তবে তার কারণে (বাহ্যত) স্থিরতা লাভ করে। আর যদি সে কোন পরীক্ষায় পড়ে যায়, তবে মুখ তুলে (কুফরের দিকে) চম্পট দেয়। (ফলে) সে ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই হারায়। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (কোন বিপদ দ্বারা ইহকালের পরীক্ষা হয়। কাজেই ইহকালের ক্ষতি তো প্রকাশ্যই। পরকালের ক্ষতি এই যে, ইসলাম ও) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে এমন কিছুর ইবাদত করছে যে, (এতই অক্ষম ও অসহায় যে,) তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না (অর্থাৎ ইবাদত না করলে কোন ক্ষতি করার এবং ইবাদত করলে কোন উপকার করার শক্তি রাখে না। বলা বাহুল্য, সর্বশক্তিমানের পরিবর্তে এমন অসহায় বস্তুর ইবাদত করা ক্ষতিই ক্ষতি)। এটা চরম পথভ্রষ্টতা। (শুধু তাই নয় যে, তার ইবাদত করলে কোন উপকার পাওয়া যায় না, বরং উল্টা অনিষ্ট ও ক্ষতি হয়। কেননা, সে এমন কিছুর ইবাদত করে, যার ক্ষতি উপকারের চাইতে অধিক নিকটবর্তী। এমন কর্মকারীও মন্দ এবং এমন সঙ্গীও মন্দ (যে কোনরূপে কোন অবস্থায়ই কারও উপকারে আসে না। তাকে অভিভাবক করা; অথবা বন্ধু ও সহচর করা কোন অবস্থাতেই তার কাছ থেকে উপকার পাওয়া যায় না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ বুখারী ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন এমন লোকও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সন্তান ও ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা গেলে তারা বলত ঃ এই ধর্ম ভাল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত দেখা গেলে বলত ঃ এই ধর্ম মন্দ। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান আছে।